স্বদেশ
সংহতি সংবাদ
হিন্দু সংহতি
Website : www.hindusamhati.org
Vol. No. 3, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, April 2014

ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মতো মরার চেয়ে বীরের মতো মরা ভাল। ...জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু ক'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই ক'রে মরাটা ভাল নয় কি?

—স্বামী বিবেকানন্দ

দঃ ২৪ পরগণার সরারহাট বাজারে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কার্তিক মেথিয়ার নৃশংস হত্যা

নিহত কার্তিক মেথিয়ার মরদেহ

সীমান্ত জেলা দঃ ২৪ পরগণা যে দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং প্রশাসন তা নিয়ন্ত্রণে যে চূড়ান্ত ব্যর্থ তা আরও একবার প্রমাণিত হল সরারহাট বাজারে কার্তিক মেথিয়ার নৃশংস হত্যার ঘটনায়। গতকাল রাত প্রায় ন'টায় ফলতা থানার সরারহাট বাজারে বিখ্যাত মিষ্টির দোকান 'ঋত্বিকা সুইটস'-এ পিস্তল বোমা সহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ হঠাৎ ঢুকে পড়ে জনা ছয়েক দুষ্কৃতি। দোকানে উপস্থিত কয়েকজন গ্রাহকের বক্তব্য অনুযায়ী নিকটবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সোনাকোপা গ্রামের বাসিন্দা কুখ্যাত এই দুষ্কৃতিরা দোকানের মালিক কার্তিকবাবুকে প্রথমে পর পর দুটি গুলি করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ধারালো তলোয়ার দিয়ে বহুবার কোপ মারে। এলাকায় সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্তিকবাবু ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এরপর ঐ দুষ্কৃতিরা দোকান লুটপাট করে বোমা ছুড়তে ছুড়তে গা ঢাকা দেয়। জনাকীর্ণ বাজারের মধ্যে এই ভয়ংকর ঘটনায় স্থানীয় মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। প্রতিক্রিয়ায় আজ সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে। বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং ফলতা রোড অবরোধ করা হয়। মানুষের ক্ষোভ পুলিশের বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য দিনের পর দিন এলাকার কুখ্যাত অপরাধীরা প্রকাশ্যে তাণ্ডব করে চলেছে কিন্তু পুলিশ এদের সম্প্রদায়গত এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ডি এস পি সাকির আলী এবং ফলতা থানার ওসি সুদীপ সিং-এর নেতৃত্বে পুলিশের বিশাল বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অবশেষে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে ডায়মন্ড হারবারের এস ডি ও মৌমিতা সাহা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গ্রামের রাসমাঠে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টাকে বাধা দিচ্ছিলেন কার্তিকবাবু।

কার্তিক মেথিয়ার মৃত্যুতে বিক্ষোভরত জনতা

সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ইঙ্গিত করছে যে এলাকার দুষ্কৃতিদের হাতে এখনও প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র মজুত আছে। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে আক্রান্ত দোকানটিতে সি সি টিভি ক্যামেরা থাকায় আশা করা যায় যে ফুটেজ দেখে পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

ছবি নিয়ে বিতর্ক
কলকাতায় বিক্ষোভ দেখালো ইসলামপন্থীরা

৩৬৫ দিন পত্রিকা অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ইসলামপন্থীরা

গত ১১ মার্চ কলকাতার মল্লিকবাজারের কাছে একটি বেসরকারি পত্রিকা (৩৬৫ দিন) অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো বেশ কিছু মুসলিম। প্রধান বিতর্ক ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিকে নিয়ে।

গত ৮ মার্চ বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। পুরুষ শাসিত সমাজে নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিতা, অবহেলিতা। তাই নারী দিবসে সারা বিশ্বের নানা স্থানে মহিলারা এইদিন নারীর মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তাদের প্রতিবাদের ভাষা থাকে বিভিন্ন রকম। তেমনই এ বছর প্যারিসের ল্যুভ্‌র পিরামিডের সামনে একাধিক অর্ধনগ্ন মহিলা তাদের শরীরের আরবি ভাষায় কিছু লেখা এঁকে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এরকম একটি ছবি ও একটি বিশেষ প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামের অবমাননা হচ্ছে এই দাবি নিয়ে বিক্ষোভকারীরা প্রথমে সি.আই.টি. রোড তারপর পার্কসার্কাস ৪ নং ব্রীজ হয়ে সবশেষ মল্লিকবাজারের কাছে ঐ পত্রিকা অফিসের সামনে বিশাল আকারে বিক্ষোভ দেখায়। রাস্তার মাঝে বিক্ষোভকারীরা টায়ার জ্বালায় এবং সেই আগুনের মধ্যে চকলেট বোমা দিয়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে। বেশ কিছু গাড়ি তারা ভাঙচুর করে। এই বিক্ষোভের জন্য প্রায় দুই থেকে তিনি ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়। তাদের দাবি ছিল পত্রিকা সম্পাদক ও ওই ছবি প্রকাশকারী সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করতে হবে। আশপাশের সমস্ত এলাকা থেকে প্রায় কয়েক হাজার মুসলিম এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। এই বিক্ষোভের চাপে পড়ে পুলিশ পত্রিকা সম্পাদক ও ওই প্রতিবেদনের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে।

অনেক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছে, এই পত্রিকাটি কিছুটা তৃণমূল ঘেঁষা সেইজন্য ভোটের আগে তৃণমূল সরকারের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই বিক্ষোভ পরিকল্পিত। তারা আরও মনে করছে, যখন শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিকরা হিন্দু ধর্মাবেগে আঘাত করে তখন বুদ্ধিজীবি-বিদ্বজনরা বলেন শিল্পী বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এর বেলা তারা চুপ কেন?

পরিকল্পিতভাবে ধর্মস্থানে আক্রমণ
দুষ্কৃতিদের মারে আহত পুলিশ অফিসার

নগর সংকীর্তনের মিছিল এবং মন্দিরের উপর পরিকল্পিত হামলা চালালো কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি। তাদের আক্রমণে শুধু মন্দিরের ক্ষতিই হয়নি বেশ কিছু ব্যক্তি গুরুতর আহতও হয়। তাদের মধ্যে মন্দির কমিটির সভাপতি গোপেশ ঘোষ মহাশয় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি হাবড়া থানার মেজবাবুও। তাঁকেও গুরুতর অবস্থায় হাবড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৪শে মার্চ, ১৪ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া জেলার সোনা কানিয়া দর্জিপাড়ায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ২৪শে মার্চ মন্দিরের উৎসব উপলক্ষে একটি নগর সংকীর্তনের মিছিল বের করা হয়। মন্দিরের কাছেই সংকীর্তন মিছিল যখন পথ পরিক্রমা করছিল তখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এক ব্যক্তি গোরুর মাংস নিয়ে মিছিলের মধ্যে এসে পড়ে। সংকীর্তনে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েরা ক্ষিপ্ত হয়ে লোকটিকে ধাক্কা মারে এবং সেখান থেকে বের করে দেয়। লোকটি নিকটবর্তী সোনা কানিয়া মুসলিম গ্রামে গিয়ে তাকে মারধোর করা হয়েছে বলে জানায়। তখন সেখান থেকে ৫০-৬০ জন মুসলমান এসে মিছিলের উপর হামলা করে। একজনকে ঘুঁষি মেরে মুখ ফাটিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, মন্দিরের পিছন দিকেও বেশ কয়েকঘর মুসলমানের বাস। তারাও সোনাকানিয়া মুসলমানদের সঙ্গে হাত লাগায়। ইতিমধ্যে মন্দির আশ্রমের সভাপতি গোপেশ ঘোষ (৬০) খবর পেয়ে

শেষাংশ ২ পাতায়

পাকিস্তান থেকে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচার
ধরা পড়ল ২ জন মহিলা সহ মোট ৬ জন

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর এবং সামলি জেলার ২ জন মহিলা সহ মোট ৬ জন অবৈধ অস্ত্রসহ ধরা পড়ল পাঞ্জাবের আটারি রেল স্টেশনে। গত ৭ই মার্চ পাকিস্তান থেকে ১১টি অটোমেটিক পিস্তল এবং ২২টি ম্যাগাজিন অবৈধভাবে ভারতে আনার সময় সমঝোতা এক্সপ্রেস থেকে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। মাংসের কিমা তৈরির মেশিনের ভিতরে এই অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গ্যাস কাটার দিয়ে ওই মেশিন কেটে সেগুলি বার করা হয়।

মুজফফরনগরের ছোট ছোট অনেকগুলি গোষ্ঠী পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং জাল নোট ভারতে আনার কাজ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়ার অছিলায় মহিলারাও এই পাচারের কাজ প্রত্যক্ষভাবে করে চলেছে। আই এস আই-এর সাথে সম্পর্কের অভিযোগে আগেও অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৫ দিনের ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল ধৃত আনিস, শাহানাজ বেগম, মোল্লা নাসিররা। পাকিস্তান থেকে আনা এইসব অস্ত্রশস্ত্র মুজফফরনগর দাঙ্গার বদলা নেওয়ার প্রস্তুতি হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। গোয়েন্দাকর্তাদের মতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে গোলমাল বাঁধানোও এর লক্ষ্য হতে পারে। বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর উপর হামলার চক্রান্তের সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের কথা

অলীক কুনাট্য বঙ্গে, মজে লোকে ভোট রঙ্গে

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। নির্বাচন কমিশন ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশন মোট ৪২টা লোকসভা আসনের জন্য পাঁচ দফা ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। ১৬ই মে ভোট গণনার পর জানা যাবে কোন রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি আসন দখল করতে সক্ষম হল। কিন্তু একটা ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা দেখার মতো। আর তা হল সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতাদের পদতলে বসে ভোটভিক্ষা প্রার্থনা করা। ভোট তরণী পেরিয়ে জয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনতে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কই যেন তাদের একমাত্র আশা-ভরসা। তাই কোনরকম দ্বিধা না রেখে সকল রাজনৈতিক দলের ভোট লড়িয়ে প্রার্থীরা নির্লজ্জের মতো আত্মসমর্পণ করেছে সংখ্যালঘু নেতাদের পায়ে। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক যে রাজনৈতিক দল নিজের পকেটে পুড়তে পারবে নিঃসন্দেহে তারা যে অধিক আসন পশ্চিমবঙ্গে লাভ করবে, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তাই এই নির্লজ্জ তোষণ। সি.পি.এম., তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু ভোট প্রত্যাশী হয়ে তোষণ করছেই, সম্প্রতি বি.জে.পি.-ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার লোভে লালায়িত হয়ে উঠেছে। বি.জে.পি-র বিভিন্ন প্রার্থীর আচরণে তা স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু অপর তিন প্রধান রাজনৈতিক দল বি.জে.পি.-কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলেই ভোটের বাজারে প্রচার করে থাকে। ব্যাপারটা আজ হাস্যকর করে উঠেছে। কথায় বলে, হিঁদু গরু খেলে মুসলমানের বাড়া। বর্তমান বি.জে.পি.-র অবস্থা অনেকটা তাই।

কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো এ হেন আচরণ পশ্চিমবঙ্গের যে কতবড় ক্ষতি করে দেবে, তা এরা বুঝেও বুঝতে চাইছে না। ভোটের বালাই এত বড় যে সংখ্যালঘুদের সমস্তরকম অন্যায় দাবি-দাওয়া তারা মেনে নেবে, তা দেশের দশের ক্ষতি জেনেও। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজ এর ফলে যে কি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তাও এদের কারো অজানা নয়। তারা উপর রেজ্জাক মোল্লা ও তার সহযোগীরা দলিত-মুসলিম ঐক্যর কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে, তা তো আজ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে এই দলিত-মুসলিম ঐক্যই পূর্ববঙ্গে বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে ওঠে। সেদিন পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা যদি এক হতে পারত তাহলে ৪৬-৪৭-এর দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের এত ব্যাপকভাবে মার খেতে হত না। ভিটেমাটি ছেড়ে একবস্ত্রে সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলায় আশ্রয় নিতে হত না। সেদিনের সেই দুর্দিন আবার বাংলার আকাশে ঘনিয়ে উঠছে। রেজ্জাক মোল্লার মতো কিছু মুসলিম ষড়যন্ত্রধারী (এতদিনে তাঁর সি.পি.এম.-এর মোহ কেটেছে) হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দলিতদের (এস.সি., এস.টি.) আলাদা করতে চাইছে। আর এই বিভেদ সৃষ্টি হলে হিন্দু সমাজের চরম বিপর্যয় হবে। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিভাজন করে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়া হবে। আর তারপর সেখান থেকে দলিত হিন্দুদের লাথি মেরে বের করে দেওয়া হবে, যেমন হয়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৪৯-৫০ সালে। দলিতদের নেতা যোগেন মন্ডল (ইনিই ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী) সেদিন রাতের অন্ধকারে এপার বাংলায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। হতাশ যোগেন মন্ডল সেদিন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, আর যাই হোক, মুসলিমদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা যায় না। আজ আবার সেই প্রেক্ষাপট সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে—শুধু সময়টা বদলে ১৯৪৭ থেকে হয়েছে ২০১৪।

রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের নেশায় এমন মশগুল যে পশ্চিমবঙ্গের এই সমূহ বিপদ নিয়ে তাদের এখন ভাবার সময় নেই। দেশনীতির চেয়ে এদের কাছে রাজনীতি বড়, দেশপ্রেম থেকে গদি বড়। আর তাই তারা অন্ধনীতিকে অনুসরণ করে অন্ধকার গহ্বরের দিকে যাচ্ছে জেনেও, মেষপালের মতো সেদিকেই ছুটছে। এটা ষড়যন্ত্রকারীরা জানে, তাই সময়টাও বেছেছে সেরকম।

এখানে একটু ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা বলা যাক। ছত্রিশ জন হিন্দু এক জায়গায় হলে ছয়টা সংগঠন হবে, অনেকগুলো মতাদর্শ গড়ে উঠবে। তাদের ভোটও পড়বে মতাদর্শগত রাজনৈতিক দলে অর্থাৎ হিন্দু ভোট ভাগ হয়ে যাবে। আর এই মনোভাবের জন্য হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক কোনদিনই গড়ে উঠবে না। এটা সবকটা রাজনৈতিক দল জানে যে হিন্দু ভোট তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য গড়তে পারবে না। তাই তারা সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের প্রত্যাশী হয়ে তাদের সমস্তরকম অন্যায় আবদারকে মেনে নিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তাই এই কঠিন পরিস্থিতির শক্ত মোকাবিলা করতে হলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা দেশেই এই ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলা দরকার। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তো সারা দেশের একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র।

সবশেষে আসি হিন্দু সংহতির কর্মীদের কথায়। লোকসভা নির্বাচনে তাদের করণীয় কর্তব্য কী? সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ সমস্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তাই পাঠিয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু সংহতি কোন রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন করে না। হিন্দু সংহতি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দল, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করা। তাই সমস্তরকম ভোট সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে সংহতি কর্মীরা যেন নিজেদের দূরে রাখে। ভোটদান প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক্ষেত্রেও সংহতি সভাপতির নির্দেশ, যে সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রার্থীরা হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসবে, সেখানে তাদেরকেই যেন সমর্থন করা হয়। কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দিয়ে তাদের লোকসভায় শক্তিশালী করা হিন্দু সংহতির লক্ষ্য নয়।

গরু পাচার চক্রের পাণ্ডা আব্দুলকে ১৩ কোটির সোনা সহ হাতেনাতে ধরল গোয়েন্দা পুলিশ

সূত্রটা বুধবার রাতেই পেয়েছিল রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দারা। সেই সূত্র ধরেই রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগণার বেলিয়াঘাটার কালিয়ানি বিলের কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স আটক করে ৪২ কেজি চারশো গ্রাম সোনা উদ্ধার করলো তারা। বর্তমানে যার বাজারদর প্রায় ১৩ কোটি টাকা। গাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বসিরহাটের সংগ্রামপুরের বাসিন্দা আব্দুল বারিক বিশ্বাস এবং গাড়ির চালক মোকসেদ মন্ডলকে। বাংলাদেশ থেকে ঐ সোনা আনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা।

এদিকে ভোটের মরসুমে এত বিপুল টাকার সোনা উদ্ধারের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে শাসকদলের বেশ কয়েকজন নেতা-মন্ত্রী সাংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। এত বিপুল টাকার সোনা পাচারের মূল উদ্দেশ্যটা কি তা খতিয়ে দেখে প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলেছে কমিশন।

কিন্তু কে এই আব্দুল বারিক বিশ্বাস? বসিরহাট মহকুমার সংগ্রামপুরে তার বাড়ি। কয়েক বছর আগেও অতি সাধারণ এক ছেলে আজ একশো কোটি টাকার মালিক। কিন্তু কিভাবে? বসিরহাট বাংলাদেশ সীমান্ত ধরে গরু পাচার করে আব্দুল। গত দশবছর ধরে অবৈধভাবে সীমান্তের ওপারে গরু পাচার করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে সে। সেই টাকায় আব্দুল বসিরহাট থানার সংগ্রামপুরে প্রাসাদতুল্য বাড়ি তৈরি করেছে। ২০০৫ সাল থেকে গরু পাচারের কাজে সে যুক্ত। অল্পদিনেই পসার ও পয়সা দুই বেড়ে চলে আব্দুলের। সেই সঙ্গে ক্ষমতাও। নিজের অবৈধ ব্যবসার খুঁটি শক্ত করতে রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে ওঠা-বসা শুরু করে আব্দুল। রাজনৈতিক নেতাদের হাত মাথার উপর থাকায় অল্পদিনেই আব্দুল সীমান্তে গোরু পাচারে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে ওঠে। বহুবার তার বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগও উঠেছে।

ডি আর আই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সোনা পাচার চক্রটি জালনোট পাচার কাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত। গত চার বছর ধরে গরু পাচার চক্রটি দারুণভাবে সক্রিয়। তারাই গরু পাচার করে বিনিময়ে সোনা ও জাল নোট এদেশে চোরাপথে ঢোকাচ্ছে। বসিরহাটের দিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ সময়েই নদী পথে পাচারের কাজ চলছে। তদন্তে জানা গিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের একাংশের সঙ্গেও যোগসাজশ করেছে পাচারকারীরা।

রবিবার ধৃত দুজনকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাদের তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ডি আর আই সূত্রে বলা হয়েছে ধৃতদের জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আবেদন করেছে তারা। অভিযুক্তের আইনজীবি গোপাল হালদার দাবি করেন, এক পরিচিতের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ওই গাড়িতে উঠেছিলেন আব্দুল। এসব ঘটনায় তিনি যুক্ত নন। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ কতখানি ঢাকা যায়, এখন তাই দেখার?

প্রভাত ফেরীতে ঢুকে গালিগালাজ

দুষ্কৃতিকে পুলিশের হাতে তুলে দিল সাধারণ মানুষ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নদাখালি থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুরের সিংপাড়ায় প্রতি বছরের মতো এবারও নাম সংকীর্তনের আসর বসেছিল। এলাকাবাসীর কথায় একশো বছরের পুরানো এই হরিনাম সংকীর্তন। গত ১৬ই মার্চ সংকীর্তন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করেন। বেলা দশটার সময় প্রভাতফেরী যখন রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন জামালউদ্দিন খাঁ (পিতা সেরব খাঁ) নামক এক ব্যক্তি হঠাৎই সংকীর্তনের মিছিল লক্ষ্য করে গালিগালাজ করতে শুরু করে। বাবুসোনা দোলুই জামালউদ্দিনকে ডেকে অকারণে গালিগালাজের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি বাবুসোনার জামার কলার চেপে ধরে তাকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। জালালউদ্দিনের এ হেন আচরণে প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জামালউদ্দিনকে ধরে তারা বেধড়ক মারে এবং তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা আছে।

১ম পাতার শেষাংশ

পরিকল্পিতভাবে ধর্মস্থানে আক্রমণ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। মিছিলে আক্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মুসলমানরা বলে কেন তাদের লোককে মারা হয়েছে। এরাও বলে উক্ত ব্যক্তি কেন গরুর মাংস মন্দিরের সামনে নিয়ে এসেছে। অবশেষে, উভয়ে বসে ব্যাপরটা মীমাংসা করে নেবে বলে ঠিক হয়। এরমধ্যে একটি পুলিশের গাড়ি এসে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে মুসলমানদের রাগ সপ্তমে চড়ে। আশপাশের গ্রাম থেকে প্রায় দু'শো মুসলমান জড়ো হয়ে মন্দির আক্রমণ করে। খবর পেয়ে হাবড়া থানার মেজবাবু ঘটনাস্থলে আসে এবং মুসলমানদের হটিয়ে দেয়। এরপর তিনি গোপেশবাবুকে অনুষ্ঠান চালানোর কথা বলেন। উৎসব-অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করে দিয়ে গোপেশবাবু যখন বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন মুসলমানরা তাকে ঘিরে ধরে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু বাচ্চা ছিল যাদের হাতে ইঁট-পাথর ছিল আর বড়দের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল। তারা গোপেশবাবুকে একা পেয়ে মারধোর করতে শুরু করে। গোপেশবাবুর এক দিদি এসে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। এরমধ্যে মেজবাবু সেখানে এলে দুষ্কৃতিরা গোপেশবাবুকে ফেলে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। তাকে হাবড়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেজবাবু মুসলমান পাড়ায় গিয়ে দুষ্কৃতিদের ধরতে গেলে দুষ্কৃতিরা মেজবাবুর উপর চড়াও হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওনাকেও হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চোদ্দ জন দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে হাবড়া থানায় একটি কেস দায়ের করা হয়েছে। এফ.আই.আর নম্বর ২৩৭/১৪।

ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার তৃণমূলের কর্ণধার খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয় ঘটনাস্থলে যান। স্থানীয় লোকজন ও মন্দির কমিটির লোকেরা এই ঘটনায় উষ্মা প্রকাশ করলে তিনি নিজে বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর জ্যোতিপ্রিয়বাবু মুসলিম অধ্যুষিত সোনা কানিয়া-য় (যেখান থেকে দুষ্কৃতিরা এসেছিল) যান এবং তাদেরকে দশ হাজার টাকা দিয়ে আসেন। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে সকলে জ্যোতিপ্রিয় বাবুর এই আচরণের নিন্দা করতে থাকেন। তড়িঘড়ি ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে তিনি পরদিন দশ হাজার টাকা মন্দির মেরামতির জন্য পাঠিয়ে দেন।

হামলাকারীদের অন্যায় আবদার: মন্দিরের পাশে মসজিদ করতে দিতে হবে

প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা থানার অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে (পোঃ-গাধামারা) বিরাট মেলা বসে। এখানে একটি শিব মন্দিরও আছে। সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মেলা হয়। গত ২৫ তারিখ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি এসে বলে এখানে মন্দিরের পাশে তাদের মসজিদ করতে দিতে হবে। এলাকার মানুষ এর প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতিরা দলে ভারী হয়ে এসে মেলার বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করে। দোকানদাররা ও মেলা কর্তৃপক্ষ তাদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিরা তাদের মারধোর করে। সুফল সরকার, শঙ্কর দাস ও প্রদীপ দাস দুষ্কৃতিদের মারে ভালোরকম জখম হয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লোকাল থানায় একটি কেস দায়ের করা হয়েছে।

জাতি ও বর্ণভেদ আর কতদিন ?

৪র্থ পর্ব

বৈশ্যের কর্তব্য, ভূমিকা ও সীমা

তপন কুমার ঘোষ

অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষও জানে যে মাছের মাথা ও পেট আগে পচে। অনেক পরে পচন ধরে লেজে। সমাজের ক্ষেত্রে এটা একশ শতাংশ সত্যি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এরপর বৈশ্যদের নিয়ে আলোচনা করা খুবই দরকারী বলে আমি মনে করি। বৈশ্যরা নিঃসন্দেহে সমাজ শরীরের উদর বা পেটের ভূমিকা পালন করে।

শরীরের যে কোন অংশে অসুখ হলে বা পচন ধরলে প্রথমে কিছুদিন সেই অসুখ শুধু সেই অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে বটে। কিন্তু তার চিকিৎসা না হলে সেই অসুখ বা পচন গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। তাই পেটের অসুখ বা উদরের নাড়িভুঁড়ির পচন মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। ঠিক সেইরকম আমাদের বৈশ্য গোষ্ঠী বা বণিক শ্রেণীর আচার আচরণ, চিন্তাভাবনা সঠিক দিশায় আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন সার্বিক সমাজের স্বার্থে।

শরীর খাদ্যগ্রহণ করে। মুখ দিয়ে আমরা খাই। তার পরেই সেই খাবার নেমে গিয়ে উদরে পাকস্থলীতে জমা হয়। সেখানে তার অবস্থানের সময়টা খানিকটা বেশি। তাই বলে অনেক বেশি নয়। গৃহীত খাদ্যবস্তু থেকে খাদ্যরস তৈরি হয়। সেই খাদ্যরস রক্তের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্যরস তৈরি হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশটুকু শরীরের বর্জনীয় পদার্থ হিসাবে মলরূপে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একজন সাধারণ চেহারার মানুষ, পেটে যার ভুঁড়ি বা চর্বি অধিক নেই, দুপুরবেলায় খুব ঠেসে ভাত খেল। তার পেটটা বেশ টাইট হয়ে একটুখানি ফুলে গেল। তারপর সে যদি পরবর্তী ছয় ঘণ্টা আর কিছু না খায়, তাহলে তার পেটটা আর ততটা ফোলা থাকবে না। কোথায় গেল সেই খাবারগুলো ? নিশ্চয়ই সেই পেটে নেই। থাকলে তো পেটটা ফোলাই থাকত। তাহলে দেখা যাচ্ছে শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে পেটে খাদ্যের অবস্থান বেশীক্ষণ নয়। অল্পক্ষণের জন্য। পেটের কাজ—যতক্ষণ পাচনক্রিয়া সম্পূর্ণ না হচ্ছে, অর্থাৎ খাদ্যরসে পরিবর্তিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ খাদ্যকে ধরে রাখা। তারপর শরীরের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় সেই খাদ্যরস শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চলে যায়। ঠিক তেমনি সমাজ যে সম্পদ সৃষ্টি করে কৃষি, শিল্প ও বহুবিধ প্রক্রিয়ায়—সেই সম্পদ গিয়ে জমা হয় বণিককুলের বা ব্যবসায়ীর ঘরে। মানুষের পেট যেমন খাদ্যবস্তু তৈরি করে না, আহরণও করে না, সেই শুধুই খাদ্যবস্তুকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের হেফাজতে জমা রাখে, ঠিক তেমনি সমাজে এই বণিককুল বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কোনরকম সম্পদ সৃষ্টি করে না। এই কথাটা আর একবার আন্ডারলাইন করে বলা দরকার। ব্যবসায়ীরা সমাজে কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না। সম্পদ সৃষ্টির জন্য তিনটি বস্তুর দরকার—শ্রম, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা (Creativity বা Creativeness)। এছাড়া অবশ্যই লাগে কাঁচামাল অথবা কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ। জমি, জল, বৃক্ষ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি অনেক কিছুই এই প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকায় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি কাঁচামালই প্রকৃতি থেকে আহরিত। এই প্রাকৃতিক সম্পদ বা কাঁচামালকে ব্যবহার ক'রে মানুষ তাকে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদে রূপান্তরিত করে। এটাকেই আমরা আমাদের আলোচনায় সম্পদ নামে বার বার উল্লেখ করব।

এই সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের শ্রম, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি লাগে। এই তিনটি গুণ সব মানুষের মধ্যে থাকে না। সারা সমাজব্যাপী ছড়িয়ে আছে এই তিনটি গুণ। তাই সম্পদ সৃষ্টির পর তা ব্যবসায়ীর গোডাউনে গিয়ে জমা হল, আর ব্যবসায়ী ভাবলো সে-ই এর মালিক—এর থেকে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। গোটা সমাজ এই সম্পদ সৃষ্টি করেছে। গোটা সমাজই এর মালিক। ব্যবসায়ী সেই সম্পদের মাত্র কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা করার ভারপ্রাপ্ত। সহজ করে বোঝানোর জন্য দু'টি উদাহরণ দেব। (এক) পাট, (দুই) জরীর কাজ করা কাপড়। পাট ফলিয়েছে চাষিরা। তাতে বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা খুব বেশি দরকার হয়নি বটে, কিন্তু পরিশ্রম হয়েছে প্রচণ্ড। পাট জমিতে প্রচুর জল লাগে। সেই জলে কাদায় নেমে কাজ করতে হয়েছে, নিড়ানি দিয়ে ঘাস তুলতে হয়েছে। পাট কাটতে পরিশ্রম আছে। কাটার পর সেই পাটকে জলে ভিজিয়ে পচাতে হয়েছে। সেখানে পাট পচার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। জল থেকে তুলে সেই পাট গাছের গা থেকে ছাড়াতে হয়েছে। ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে রোদে শুকোতে হয়েছে। শুকনোর পর সুন্দর করে বাণ্ডিল বাঁধতে হয়েছে। পাট চাষির ঘরে শুধু চাষি নয়, তার বউ, ছেলে, মেয়ে—সবাই সেই কাজে হাত লাগিয়েছে। অনেকেরই হাতে পায়ে হাজা ধরে গেছে। এতখানি পরিশ্রমের পর চাষি সেই পাট নিয়ে মহাজনের কাছে বিক্রি করে এল। তার মানে কি ঐ পাটের উপর চাষির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেল ? আর ঐ মহাজন, সে-ই হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ মালিক ? না এটা হতে পারে না। ঐ পাট শেষ পর্যন্ত যে প্রোডাক্ট (উৎপাদিত দ্রব্য) হয়ে মানুষের ব্যবহারে লাগছে, সেই স্তর পর্যন্ত যে রোজগার বা লভ্যাংশ তার অনেক বেশিরভাগটাই পাবে ঐ মহাজন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা! তাদের বাড়ি উঠবে, গাড়ি হবে, সমস্ত বিলাসদ্রব্য তারা ভোগ করবে, আর সেই পাট উৎপাদনকারী চাষি—তার বাড়িতে কেরোসিনের লম্ফ জ্বলবে, তার ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে না গিয়ে এক হাঁটু পচা জলে দাঁড়িয়ে বাবাকে পাট ছাড়ানোর কাজে সাহায্য করবে—এটা চলতে পারে না।

(দুই) জরীর কাজ—বড়বাজারের ব্যবসায়ী জরী শিল্পীকে দিল প্লেন শাড়ি, জরী, সুতো, পুঁতি, চুমকি, রঙিন পাথর ইত্যাদি। কখনও কখনও নক্সা বা ডিজাইনও দিয়ে দেয়। সেই ডিজাইন ঐ ব্যবসায়ী তৈরি করে নি। কাগজের উপর এঁকে দিয়েছে কোন শিল্পী। সেই ডিজাইন অনুসারে অথবা নিজেরই তৈরি ডিজাইন দিয়ে জরী শিল্পীর ছেলে মেয়েরা, পুরুষ ও স্ত্রী রা ঘাড় গুঁজে দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে একটি সুন্দর, ঝলমলে উচ্চ শিল্পকলাযুক্ত শাড়ি তৈরি করল। ব্যবসায়ীর ঘরে দিয়ে এল। এত পরিশ্রম করে সারা মাসে সে সাত-আট হাজার টাকা রোজগার করতে পারল। কাঁচামাল লেগেছে হয়তো এক হাজার কি দু'হাজার টাকার। এই শাড়িটা বাজারে বিক্রি হবে ২০ হাজার টাকায়। ঐ জরী শিল্পীর সারা মাসের রোজগারকে শাড়ির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে যে পাঁচশ টাকার বৈশি ঐ শাড়ির মজুরী পায়নি। ঐ ব্যবসায়ী যদি ভাবে (আজকাল তা-ই ভাবে) যে ঐ শাড়ি বিক্রি করে যত লাভ পাওয়া যাবে সেই সবটারই সে একা মালিক, তাহলে সেই ভাবনা নিশ্চিত ভুল। ঐ শাড়ি ঐ ব্যবসায়ী তৈরি করেনি, ঐ শিল্প ঐ ব্যবসায়ী সৃষ্টি করেনি। সমাজ তা করেছে। তাই ঐ শাড়ির আসল মালিক সম্পূর্ণ সমাজ, ঐ ব্যবসায়ী একা নয়। সে কিছু সময়ের জন্য রক্ষক (Preserver) বা অছি (ট্রাস্টি) মাত্র। পেট যেমন কোন খাদ্যবস্তু নির্মাণ করে না, ঠিক তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমাজে কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না। করে গোটা সমাজ তার শ্রম, বুদ্ধি ও শিল্পপ্রতিভা (সৃজনশীলতা) দিয়ে।

মানুষের পেট যদি ভাবে আমার কাছে খাবার এসেছে, আমিই এর মালিক, আমিই এটা রেখে দেব, শরীরের অন্য কোন অংশে পাঠাবো না, তাহলে কী হবে ? প্রথম ক'দিন পেট একটু ফুলতে পারে। তারপরেই শুধু হয়ে যাবে অজীর্ণ বা পেট খারাপ। পাতলা পায়খানা হয়ে বেরোতে থাকবে, আর হাত-পা গুলো শুকিয়ে যাবে। আরও কিছুদিন এই অবস্থা চললে মস্তিষ্কেও এর কুপ্রভাব পড়বে এবং বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করবে না। ফলে কী হবে ? গোটা শরীরটাই অসুস্থ হয়ে পড়বে। মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। শুরুটা কোথায় হয়েছিল ? পেট থেকে। পেট খাদ্যবস্তুকে প্রক্রিয়া করে শরীরের বিভিন্ন অংশে না পাঠানোর ফলে এবার লোকটা যদি মারা যায়, তাহলে পেটটা কোথায় থাকবে ? পেট যে স্বার্থপরের মত খাদ্যকে একা ভোগ করতে চেয়েছিল তা আর পারবে কি ? না, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে পেটও খতম।

ঠিক তেমনি সমাজের দ্বারা নির্মিত বা সৃষ্ট সম্পদ যদি ব্যবসায়ীরা একা ভোগ করতে চায়, তার পরিণামও ঠিক ঐরকম হবে। মাছের পেট পচার মত এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেরা আগে অসুস্থ হবে, বিকৃতির শিকার হবে, তাদের পরিবার এবং তাদের সন্তানরা আগে নষ্ট হবে। আর সমাজের অন্যান্য অঙ্গও শুকিয়ে যেতে থাকবে। তাই বণিক সমাজকে খুব স্পষ্ট করে একথা বুঝতে হবে যে সমাজ দ্বারা তৈরি সম্পদের তারা অল্পসময়ের জন্য অছি মাত্র, মালিক নয়। মালিক গোটা সমাজ, তাই ঐ সম্পদ থেকে যে লভ্যাংশ অর্জন হবে সেই লভ্যাংশকে গোটা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঐ লভ্যাংশ দ্বারা যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হবে, সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মালিক শুধু ঐ ব্যবসায়ীই নয়। গোটা সমাজেই সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে, বিতরণ করতে হবে। বিতরণ মানে দান নয়, দয়া নয়, ন্যায্য distribution।

এখন কথা হচ্ছে, শরীর চলে প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই পেট কোন বাঁদরামি ত্যাঁদরামি করতে পারে না। কিন্তু সমাজ তো প্রাকৃতিক নিয়মে চলে না, চলে মানুষের তৈরি নিয়মে। সুতরাং, সমাজ তৈরি করল সম্পদ, সম্পদ থেকে অর্জিত হল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বণিকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সমাজের সমস্ত অংশের মধ্যে বিতরণ করে দেবে—এ আশা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের সমাজ রচয়িতারা সে আশা করেনও নি। সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই এরকম অবাস্তব আশা করা হয় না। সম্পদ দ্বারা অর্জিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য (এবং জীবনে উন্নতির উপকরণ) সমাজের সমস্ত অঙ্গে সমবন্টন করার দায়িত্ব থাকে প্রশাসনের বা শাসকের। সেই সুষ্ঠু বন্টনের জন্য, যাতে গোটা সমাজের উন্নতি হয়, বেশ কিছু নিয়মনীতি তৈরি করতে হয় ও সেগুলো পালন করতে হয়। এই নিয়মনীতিগুলি তৈরি করার দায়িত্ব বা অধিকার শাসকের বা রাজার ছিল না আমাদের দেশে। এই নিয়মনীতি সঠিকভাবে, নিরপেক্ষভাবে কে তৈরি করতে পারে, খুব সহজ করে বল্‌লে—যে নিজের কোলে ঝোল টানবে না। যে সমাজের সকলের কল্যাণকামী হবে। তার মানেই তাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। তাঁরা কারা ? ব্রাহ্মণরা ? সম্ভবতঃ না। এই নীতি নিয়মগুলি তৈরি যাঁরা করতেন তাঁরা ঋষি নামে অভিহিত ছিলেন। এই ঋষি গৃহস্থও হতেন, সন্ন্যাসীও হতেন। ঋষি মানে কখনই শুধু সন্ন্যাসী নন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অনেক গৃহী বা সন্ন্যাসী আমাদের সমাজে ঋষি আখ্যা পেয়েছেন। ঋষি হতে গেলে ভগবৎ সাধনা করাটা বোধহয় খুব আবশ্যিক ছিল না। নিঃস্বার্থ ও সর্বজীবের কল্যাণকামী হওয়াটা আবশ্যিক ছিল। রাজর্ষি জনক চুটিয়ে রাজত্বও করতেন, সংসারও করতেন। ভগবৎ সাধনা কতটা করতেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু তিনি ঋষি ছিলেন। আধুনিক যুগে শ্রী অরবিন্দ খুবই বেশি রকমের ভগবৎ সাধনা করতেন। এমন কি সাধনার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি ঋষি। কিন্তু বৃটিশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের ভগবৎসাধনার কথা কিছু জানা যায় না। ম্যাজেস্টারী করেছেন, আফিম সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং একাধিক স্ত্রী তাঁর জীবনে ছিল (একই সময়ে নাও হতে পারে)। সাহিত্যও প্রচুর রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি বঙ্কিম নামে অভিহিত করি। ঋষিরা নিঃস্বার্থ বলে সত্যদর্শন করতে পান। বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর গৃহস্থী হয়েও সহজেই সত্যদশ্যন করতেন। তাঁর মুখের বা লেখার এক একটি বাক্যে, এক একটি কথায় আমরা সেই অমোঘ সত্যকে অনুভব করতে পারি (উদা ঃ 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র', 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন', ইত্যাদি।)

এই নিঃস্বার্থ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সমাজের জন্য নীতি ও নিয়ম তৈরি করতেন। আর এই নিয়মগুলিকে যিনি সঙ্কলন ও সূত্রবদ্ধ করতেন, তাঁকে বলা হত স্মৃতিকার। উদাহরণ—মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক ইত্যাদি। এই নীতি ও নিয়ম মেনে গোটা সমাজকে চলতে হত। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলকে। কিন্তু সবাই কি স্বেচ্ছায় এইসব নিয়মকানুন মেনে চলত ? অবশ্যই না। তাদেরকে মানানোর জন্যই ছিল রাজদণ্ড। অর্থাৎ নীতি বা আইন প্রণয়ন করবেন ঋষিরা, আর তাকে লাগু করবেন রাজা বা রাজশাসন। এখানেই আসে শাসন ও শাসকের গুরুত্ব। শাসক বা রাজাকে কঠোরভাবে ঋষিদের দ্বারা নির্ধারিত নিয়মগুলিকে প্রজাদেরকে দিয়ে পালন করাতে হবে। না করলে শাস্তি। শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাজার ছিল, রাজার থাকতে হবে।

তাই সমাজসৃষ্ট সম্পদের লভ্যাংশ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বণিকশ্রেণী একা আত্মসাৎ না করে, কঠোর শাসনের দ্বারা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজার উপর ছিল। আজ সেই দায়িত্ব সরকারের। এই নীতি অনুসারে স্পষ্টভাবেই সরকারের দুটো ভাগ থাকা উচিত। একটা ভাগ আইন তৈরি করবে, আর একটা ভাগ সেই আইনকে লাগু করবে। প্রথম যখন ভারতের সংবিধান তৈরি হয়, তখন সরকার সেটা তৈরি করেনি পৃথকভাবে গঠিত একটি সংবিধান সভা সেই সংবিধান তৈরি করেছিল। তারা সরকার নয়। আজও সেই আইন যদি কোন রদবদল করতে হয়, বা নতুন আইন তৈরি করতে হয়, তা তৈরি করবে আইন সভা---যাকে আমরা সংসদ বা বিধানসভা বলি। এই দুই সভার সদস্যরা আইন

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

বৈশ্যের কর্তব্য, ভূমিকা ও সীমা

তৈরি করবেন কিন্তু লাগু করতে পারবেন না। আইন লাগু করার দায়িত্ব সংসদ বা বিধানসভার নয়। সেই দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসন কাকে বলে? ডি.এম., এস.পি., রেভিনিউ অফিসার, ইনক্যাম ট্যাক্স অফিসার, সেলস্ ট্যাক্স অফিসার, ফরেস্ট অফিসার, এল. আর.ও., ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ পরিচালনকারীদের মধ্যে এই দুটি গোষ্ঠীর, আইন প্রণয়নকারী (এম.পি., এম.এল.এ.) ও প্রশাসনিক অফিসাররা উভয়েই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে আইনভঙ্গকারীকে সাজা দেবে কে? এই সুযোগটাই নিয়েছে বণিক সমাজ। ফলে সমাজের শ্রম ও প্রতিভায় সৃষ্ট ধন, সম্পদ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ—এগুলির সমবন্টন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বণিকশ্রেণী মনে করছে এতে তাদের একাধিকার। আর রাজনৈতিক দল, নেতা ও অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তারা এই চরম অন্যায় কাজ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। এই বণিকসমাজ সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের প্রতিনিধিকে ঢুকিয়ে দিয়ে, ভোটে জিতিয়ে এনে পুরো রাজনীতিটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে। ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিড়লা, টাটা, মুন্দ্রা থেকে শুরু করে বর্তমানে মুকেশ আম্বানী পর্যন্ত এর স্পষ্ট উদাহরণ। তাদের, শুধুমাত্র তাদের স্বার্থ নজরে রেখে দেশের আইন তৈরি হচ্ছে। বণিক সমাজের সম্পদের ভাণ্ডার আরও স্ফীত হচ্ছে। আর সমাজের অন্য অনেক অংশ শুকিয়ে যাচ্ছে, নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে, উন্নতি ও উন্নয়নের সমস্ত ফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থনীতির তথাকথিত উদারীকরণ সমাজের বিশাল শ্রমজীবি অংশের উপর নতুন করে পুঁজিবাদী শোষণ চাপিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এরকম বহু পরিস্থিতির, ঘটনার সাক্ষী। একটা খুব ছোট ও সহজ উদাহরণ দেব। আজ এই নতুন মুক্ত অর্থনীতিতে বহু বহু (বিশেষতঃ প্রাইভেট সেক্টরে) কর্মক্ষেত্রেই শ্রমিক বা কর্মচারীর কাজের সময় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে ১২ ঘণ্টা। এটা কেন হবে? এটা কি অন্যায় নয়? এটা কি শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণ ও অত্যাচার নয়? নিজেকে ও পরিবারকে বঞ্চিত করে এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলটা কে ভোগ করছে? ঐ শ্রমিকটি কি? না, কখনোই নয়। তার যে মালিক, সে। এই সহজ নিয়মটা আরও সহজেই লঙ্ঘন করা হল যে, একটা মানুষের জীবনে একটা দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনভাগের একভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যয় হবে তার নিজের উপর। ঘুম, খাওয়া, স্নান, শয্যা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি। আর এক ভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যবহৃত হবে জীবিকা উপার্জনের কর্মের জন্য। এবং আর একভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যবহার হবে সমূহের জন্য, নিজের ছাড়া বাকি সকলের জন্য এবং সবকিছুর জন্য। তার মধ্যে আসবে তার নিজের পরিবার, পাড়া, গ্রাম বা শহর, দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সব। এই তৃতীয় অংশটাকে ভীষণভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, বহু মানুষের জীবন থেকে। তার ফলে ব্যক্তি সামাজিক কর্তব্য পালন তো দূরের কথা, পারিবারিক কর্তব্যও পালন করতে পারে না। আমার নিজের দেখা বহু ঘটনা যেখানে মা-বাবাকে সারাদিন ও অনেকটা রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয় সংসার চালানোর জন্য। বাড়ির ছেলে বখে যায় আর মেয়ে মুসলমানের পাল্লায় পড়ে লাভ জেহাদের শিকার হয়।

অর্থাৎ বণিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর অশুভ আঁতাতের ফলে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাচ্ছে ও নিষ্পেষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়—সমাজ বাঁধুনিও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই এই বণিকশ্রেণী বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। সেই নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব শাসকের আর শাসককে সেই কাজে বাধ্য করার দায়িত্ব সর্বসাধারণ সমাজের।

প্রাচীনকালে বা অতীতে আমাদের দেশে এই বণিকশ্রেণী মোটেই নিন্দার পাত্র ছিল না। ভারতের শিল্পীদের সৃষ্টি অপূর্ব শিল্পকলা, ভারতের মেধা ও প্রতিভা প্রসূত লৌহশাস্ত্র ও রসায়ন শাস্ত্রের উৎপাদিত অসাধারণ দ্রব্যগুলি গোটা পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বিপুল সম্পদ ভারতে এনেছিল ও বিদেশে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছিল। সেই সপ্তডিঙার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী যেন আমাদের Collective Memory -তে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ের এই বাংলার কথা আমরা বেশ কিছুটা জানি। ঘরে ঘরে আকাল ছিল না, দারিদ্র্যের কষাঘাত ছিল না, উদয়াস্ত পরিশ্রমের অব্যক্ত যন্ত্রণা ছিল না। ঘরে ঘরে সুখশান্তি ছিল—হাসি ছিল, গান ছিল। পুণ্যিপুকুর থেকে পৌষল্যা, দোল-দুর্গোৎসব, ভাদু-টুসু-গাজন-নবান্ন থেকে বারুণী উৎসব অনুষ্ঠানে সারা বছর ভরে থাকত। বারো মাসে তেরো পার্বণ কথাটা তো সবাই জানে। প্রাচুর্য্য ছাড়া কি এত উৎসব করা যায়? মনের শান্তি ছাড়া কি এত উৎসব করা যায়? এই প্রাচুর্য্য কে তৈরি করেছিল? পুরো সমাজই তা তৈরি করেছিল। মনুষ্য শরীরের উদরে তৈরি হওয়া খাদ্যরসের মত সেই প্রাচুর্য্য গোটা সমাজশরীরের ছড়িয়ে পড়ত। শুধু বণিকশ্রেণী একা তা ভোগ করত না। সেই ছড়িয়ে পড়াকে সুনিশ্চিত করত রাজার শাসন। শাসন চালানোর জন্য নীতি বা আইন তৈরি করে দিতেন ঋষিরা।

আজ পয়সার প্রভাবে বণিকশ্রেণী, যারা উৎপাদন করতে পারে না, সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না, তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে শাসকশ্রেণীকে। শাসকশ্রেণী এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই রাজতন্ত্রের অবসান হলেও নতুন করে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ আমাদের সমাজের ওপর চেপে বসেছে। মানুষ এখন ১২ ঘণ্টা কাজের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তার হয়ে কথা বলার কেউ নেই। তাকে এই নিষ্পেষণের হাত থেকে বাঁচানোর কেউ নেই। এর শেষ পরিণাম ভাল হতে পারে না। এই শেষ পরিণাম—রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা সমাজের মৃত্যু। আর ওই রাষ্ট্রবিপ্লবকে রোখার জন্য বণিকশ্রেণী তার নিজ স্বার্থরক্ষার কাজে লাগায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আইন, আদালত ও প্রশাসনকে।

আর একটা কথা না বললেই নয়। দেশের মধ্যে শাসন চালানো বা আইন লাগু করার দায়িত্ব যেমন সরকার বা শাসকের উপরে থাকে, ঠিক তেমনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্বও শাসকেরই কাজ, তার কাজের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই কাজে ব্যর্থ হলে দেশের সৃষ্ট বা লব্ধ সম্পদ মুহূর্তে তছনছ হয়ে যাবে, লুণ্ঠিত হয়ে যাবে। এছাড়া আমরা দাসে পরিণত তো হবই। তাই এই দেশ রক্ষার কাজ সম্পদসৃষ্টির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোন ঢিলেমি, কোন সমঝোতা চলে না। আর এই কাজে শক্তি দরকার (সামরিক শক্তি)। আর এই শক্তিকে পরিচালনা যারা করবে তাদেরকে সাহসী হতে হবে। তাই অতীতে শুধু ক্ষত্রিয়রাই আমাদের শাসক বা রাজা হতেন। তর্কের কচকচিতে না গিয়েও সকলেই জানেন যে, ব্যবসায়ীকুলে অন্য অনেক গুণ থাকলেও তাঁরা বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করার মত সাহসী নন। তাঁদের সাহসী না হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ ব্যবসা হয় শান্তির সময়ে। অভিজ্ঞতায় খুব স্পষ্টভাবেই বারবার দেখা গিয়েছে যে, ব্যবসায়ীরা যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে চান—আপোস করেও, সমঝোতা করেও। ক্ষত্রিয়রা মোচ (গোঁফ) এর জন্য লড়ে। অর্থাৎ সম্মানের জন্য লড়ে, ব্যবসায়ীরা কখনই নয়। গুণ্ডা ছুরি বা বন্দুক নিয়ে গেলেই ব্যবসায়ী গোপনে তার সঙ্গে সমঝোতা করে নেয়। এদের হাতে যদি দেশরক্ষার ভার পড়ে, তাহলে দেশের কী অবস্থা হবে? যারা দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল, সেলিম বা সোহ্‌রাব (বড়বাজার)-এর মত গুণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস রাখে না, তারা চীন, পাকিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়ার মত আন্তর্জাতিক গুণ্ডাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কোমর ভাঙার সময় ভারতকে চোখ রাঙাতে আমেরিকা তার বিখ্যাত সপ্তম নৌবহরপাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে দাবাতে পারেনি। এখানে ইন্দিরা গান্ধীর সাহস বা ক্ষাত্রতেজ প্রকাশিত হয়েছিল। কোন ব্যবসায়ী এই সাহসের পরিচয় দিতে পারতো না। সমঝোতা করে নিত। নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও সত্য লঙ্ঘন করে গান্ধীজী যে দেশবিভাগকে মেনে নিলেন ও কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবন ভেঙে তছনছ করে দিলেন—কেন? কারণ, জিন্না, সুরাবর্দী-নিজামের গুণ্ডামির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন না ও মোকাবিলা করতে পারলেন না বলে। এই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও আপোষকামিতার পিছনে তাঁর বেনিয়া রক্ত কতটা কাজ করেছে তা জানি না, কিন্তু তাঁর উপর ঘনশ্যাম দাস বিড়লার প্রভাব যে কাজ করেনি, তা জোর দিয়ে বলা যায় কি? সবাই জানে বিড়লার কোষাগার গান্ধীর জন্য খোলা ছিল। তাই তার প্রভাব এড়ানো গান্ধির পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ করি, যে গান্ধি একসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে গিয়েছিলেন (যদিও বৃটিশের সেবা করতে) সেই গান্ধি জিন্না-নিজাম-সুরাবর্দীর রক্তমাখা ছুরির সামনে নির্বীর্য হয়ে গেলেন, এটা অনেকটাই বিড়লার প্রভাবে।

এই উদাহরণটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শাসককে সাহসী হতে হবে, ক্ষাত্রবীর্য সম্পন্ন হতে হবে। যা বেনিয়াগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই দেশরক্ষা ও দেশ চালানো—এই দুটো কাজেই ক্ষাত্রবৃত্তি বা ক্ষত্রিয় প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের কাজ, বেনিয়া মানসিকতার, সমঝোতাকামী মানসিকতার লোকের কাজ নয়। বেনিয়াকুলের প্রকৃত অবস্থান, দায়িত্ব, ভূমিকা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এই সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শাসন চালনায় তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে তাদের অধিকার সীমিত করতে হবে ও সমাজসৃষ্ট সম্পদের ফল গোটা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে এই কাজ অত্যন্ত দরকারী।

ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ঃ হাওড়ার মালিকপাড়ায় র‍্যাফ নামলো

গত শুক্রবার ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল হাওড়া জেলার বড়গাছিয়া মালিকপাড়ায় (থানাঃ জগৎবল্লভপুর)। পাকিস্তানপন্থী খাদন মল্লিকের দেশদ্রোহীমূলক আচরণ এলাকাবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত এলাকায় র‍্যাফ নামাতে হয়।

শুক্রবার (২১শে মার্চ) টোয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। হাওড়ার বড়গাছিয়া অঞ্চলের মালিকপাড়ার অভিযান সমিতি ক্লাবের সদস্যরা ক্লাবঘরেই বসে ম্যাচ দেখছিল। ভারত জেতার মতো অবস্থায় গেলে অভিযান ক্লাবের সদস্যরা বাজি পোড়াতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচ জিতে গেলে সকলে মিলে আনন্দে মেতে ওঠে। বাজিও পোড়াতে থাকে। আর এতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে মালিকপাড়ার একমাত্র মুসলিম পরিবার খাদন মল্লিকরা। তারা পুলিশকে ফোন করে বাজি পোড়ানোর বিরুদ্ধে নালিশ করে। পুলিশ এসে অনন্ত মান ও ও মনোজ মান নামক দুই ব্যক্তিকে (সম্পর্কে তারা কাকা-ভাইপো) গ্রেপ্তার করে। এতেই এলাকাবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে খাদন মল্লিকের বাড়ি ঘেরাও করে। খাদন মল্লিকের ফোনে তখন অন্যান্য পাড়া থেকে মুসলমানরাও সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। বেগতিক দেখে পুলিশ শেষ পর্যন্ত এলাকায় র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়। র‍্যাফ এসে তখনকার মতো পরিস্থিতি সামাল দেয়। কিন্তু ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা আছে। এলাকায় জগৎবল্লভপুর থানা থেকে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে।

মূক ও বধির কিশোরীকে ধর্ষণ বর্ধমানে

গত ৬ই মার্চ, পূর্বস্থলী থানার মিসবাপুরে এক মূক ও বধির কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে আনোয়ার শেখ। এই আনোয়ার শেখ তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা সালিশী সভার মাধ্যমে রফা করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত রফা না হওয়ায় ধর্ষিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

আসামের চিরাং-এ বড়ো যুবতীকে ধর্ষণ

প্রতিক্রিয়ায় হত দুই, পালাচ্ছেন সংখ্যালঘুরা

পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণে অভিযুক্ত ধৃতরা

এক বোড়ো যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো আসামের চিরাং জেলা। গত ২৯শে মার্চ, শনিবার সকালে চিরাং জেলার আমগুড়ি থানার বলদি গ্রামের ওই যুবতীটি নিকটবর্তী নদীতে মাছ ধরতে গেলে ৬-৭ জন দুষ্কৃতি তার উপর হামলা করে। যুবতীটিকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দুষ্কৃতিরা গণধর্ষণ করার পরে তাকে নৃশংসভাবে খুন করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ধর্ষণকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মারমুখী জনতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক মারধোর, এবং অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেছে। বিক্ষিপ্ত ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ধর্ষণে যুক্ত থাকার সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশের কারণে আসামের জনসংখ্যার ভারসাম্য যেভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চাপে একদিকে যেমন তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে, পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তাও সংকটে পড়ে যাচ্ছে এদের অপরাধপ্রবণতার কারণে। পাশাপাশি চলছে তোষণের নির্লজ্জ রাজনীতি। ফলে এই সব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

ভারতে ধর্মান্তরকরণের নয়া চক্রান্ত

জোট বাঁধলো খ্রিস্টান এবং মুসলিম নেতৃত্ব

এবার ভারতে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল খ্রিস্টান ও মুসলিম নেতারা। আজও বিশ্বব্যাপী দাসপ্রথা চলছে, বলপূর্বক মহিলা ও শিশুদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করানো হচ্ছে, চলছে নারী পাচার। এই সকল বিষয়ে আমাদের দেশ প্রথম সারিতে আছে বলে বলা হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভ্যাটিকান সিটির পোপ ফ্রান্সিস, ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ এবং মিশরের আল-আজহারের ইমাম যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভিন্ন মহলে কথা উঠছে যে এই পদক্ষেপ ধর্মান্তরকরণের একটা নতুন উদ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন উঠছে যে দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের এই মহান উদ্দেশ্যের প্রতি যদি সত্যিই আন্তরিকতা থাকে, তাহলে সোমালিয়া, হাইতি, পাকিস্তান প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ খ্রিস্টান এবং মুসলিম অধ্যুষিত—প্রথমে সেখানকার সমস্যার সমাধান করতে এদের উদ্যোগী হওয়া উচিৎ। Global Slavery Index অনুসারে উক্ত সমস্যাপীড়িত দেশগুলির মধ্যে ভারত ছাড়া প্রথম সারির সবগুলো দেশই হয় মুসলিম বা খ্রিস্টান দেশ। এই পরিস্থিতিতে খ্রিস্টান ও মুসলিম নেতাদের ভারতের নিপীড়িত মানুষের প্রতি এই দরদ সন্দেহের উর্দ্ধে নয়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি বিকর্ণ নস্কর বলেন যে, বিশ্বে আজ অনেক খ্রিস্টান এবং মুসলিম দেশ আছে যেখানে চরম দারিদ্র্য এবং ভ্রাতৃঘাতী হিংসা অব্যাহত। আফগানিস্তানের মত ইসলামিক দেশে মহিলাদেরকে মানুষ বলে মনে করা হয় না। পোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইমামদের উচিত নিজের ধর্মের দেশের দারিদ্র্য, মানবতা বিরোধী হিংসা ও মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার বিষয়ে বেশি সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু তারা এই কাজ না করে যখন ভারতবর্ষকে নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে সম্প্রসারণবাদী এই দুই ধর্মের নেতারা সেবার নামে ভারতবর্ষের সরল, ধর্মভীরু ও মানবতাবাদী হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরকরণ করে মুসলিম বা খ্রিস্টান বানাতে চায়। কেননা একজন হিদেন (অখ্রিস্টান)-কে খ্রিস্টান করা এবং একজন কাফের (অমুসলমান) কে মুসলিম করাকে

COUNTRIES WITH HIGHEST PREVALENCE OF MODERN SLAVERY

Country	Rank	Christian	Muslim
Mauritania	1		100 %
Haiti	2	96%	
Pakistan	3		97%
India	4	2%	13%
Benin	7	43%	25%
Cote D'Ivoire	8	33%	39%
Gambia	9	8%	90%
Senegal	11	5%	94%
Ethiopia	12	20%	34%
Sierra Leone	13	10%	60%
Eritrea	16	50%	50%

এরা এদের ধর্মের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। সেজন্য এরা খ্রিস্টান এবং মুসলিম দেশের সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তিত নয় কারণ সেখানে সবাই খ্রিস্টান অথবা মুসলমান হয়ে গেছে।

উপরের টেবিলে নির্দেশিত তথ্য অনুসারে একথা পরিষ্কার যে দাসত্ব সেইসব দেশেই বেশি যেগুলি হয় খ্রিস্টান অথবা মুসলিম অধ্যুষিত। তাই এটাই যুক্তিযুক্ত যে মুসলিম এবং খ্রিস্টান নেতাদের উচিৎ সেই দেশগুলির সমস্যা নিয়ে প্রথমে মাথা ঘামানো।

বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হল জেলা পুলিশের তৎপরতায়। পুলিশ সূত্র অনুসারে এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট ৩৯২টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬৮৬ রাউন্ড গুলি এবং ১৮৮২টি তাজা বোম বাজেয়াপ্ত করা গেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলা পুলিশের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

গত ২২শে মার্চ আউশগ্রাম থানার পুলিশের তৎপরতায় ভেদিয়া বাজার এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পরে আনিসুর রহমান নামক জনৈক দুষ্কৃতি। মেহেদিবাগানের কুখ্যাত সমাজবিরোধী মাখন সেখকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, এই মাখন সেখ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রায়না অঞ্চলে অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এদিকে গলসী থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে সেখ খোকন এবং লোকবাহাদুর লামা। তাদের কাছে দেশী বন্দুক এবং ড্যাগার পাওয়া যায়। অপর দিকে সাহিদ দফাদার নামক কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে দু'টি পিস্তল এবং ১৮ রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। এই সাহিদের নাম আগে থেকেই স্থানীয় থানায় ডাকাতি, খুন এবং অস্ত্র ব্যবসার অভিযোগ আছে।

অন্যায়ভাবে জমি দখলের চেষ্টা

বাধা দিতে গিয়ে গুরুতর আহত মা ও ছেলে

৩৫ বছর ধরে বসবাসকারী শ্যামসুন্দর প্রামাণিকের জমি জবরদখল করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন শ্যামসুন্দরের স্ত্রী পাঁচু প্রামাণিক এবং ছেলে গৌতম প্রামাণিক। সূত্রের সংবাদ অনুযায়ী গত ১৩ই মার্চ দঃ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার ছোটপোল (শরিফনগর) গ্রামের বাসিন্দা শ্যামসুন্দরের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে খতিফ পুরকাইত নামের জনৈক প্রতিবেশী প্রায় চার-পাঁচশ লোক জড়ো করে। খবর পেয়ে শ্যামসুন্দরের স্ত্রী ও ছেলে প্রতিবাদ করতে গেলে সেকেন্দারপুর, দিগবেড়িয়া, লালপুর, শরীফনগর গাজীপাড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে আগত দুষ্কৃতিরা খতিফের নেতৃত্বে তাদের উপর চড়াও হয়। মারের চোটে পাঁচু প্রামাণিক ঘটনাস্থলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং গৌতমের ডান হাতের দুটি আঙুল কাটা যায়। স্থানীয় মানুষদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও দুষ্কৃতিরা থানায় যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে রাখে। পরে হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তা রাজকুমার সরদারের সহায়তায় মহঃ খতিফের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করা সম্ভব হয়। নাইয়ারাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আহতদের চিকিৎসা করানো হয়েছে।

মুজফ্ফরনগর দাঙ্গায় যুক্ত মুসলিম অপরাধীদের আড়াল করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হল

গত বছর সেপ্টেম্বরে মুজফ্ফরনগরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে অভিযুক্ত মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার উত্তরপ্রদেশ সরকারের অপচেষ্টা বিরাট ধাক্কা খেল চার্জশিটে মুসলিম নেতাদের নাম যুক্ত করায়। উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই অপচেষ্টার কথা জানাজানি হতেই দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকও তীব্র আপত্তি জানায়। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট্ ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে এবং ১০ জন মুসলিম নেতার নাম চার্জশিটে যুক্ত করা হয়। এই ঘটনা আমাদের দেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির তোষণমূলক মানসিকতাকেই প্রতিফলিত করে। সেক্যুলারিজমের নামে কিভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা হচ্ছে এই ঘটনা তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। মুজফ্ফরনগরের দাঙ্গার ঘটনা একটি বড় ঘটনা এবং বহু প্রচারিত ঘটনা। তাই এই ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু ছোট ছোট অনেক ঘটনা দেশব্যাপী গ্রামেগঞ্জে ঘটে চলেছে, হিন্দুর উপর অত্যাচার চলছে। সেখানে এইভাবেই চলছে পক্ষপাতমূলক আচরণ। সেই সমস্ত ঘটনা প্রচারিত না হওয়ায় এই ধরনের অন্যায়ের খবর কেউ জানতে পারছে না। বিচারের বাণী কেঁদে মরছে নীরবে নিভৃতে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে জোর করে জমি দখল করলো মুসলমানেরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি থানার অন্তর্গত গ্রামে ভৃগুরাম হালদারের পি.ডব্লুই.ডি. রাস্তার সংলগ্ন জমিটি জোর করে দখল করলো মুসলমানেরা। অত্যন্ত নিরীহ মানুষ ভৃগুরাম রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাস্তু জমির পশ্চিম দিকের প্রায় ২৫ হাত লম্বা জমি জালান সেখ (পিতা রহমান সেখ), বাবুরানি বৈদ্য (পিতা মিঞাবর বৈদ্য), রহিচ বৈদ্য (পিতা মিঞাবর বৈদ্য), আলাউদ্দিন বৈদ্য (পিতা মৃত মাদাব বৈদ্য), সাবির মোল্লা (পিতা খালিল মোল্লা)-কে ব্যবসা করার জন্য দান করতে বাধ্য হয়। গত ৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার এক মীমাংসা ছাড়পত্রে উক্ত জমি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক মাস আগে। ভৃগুরাম ঐ জমিটি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দুজনের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা করে অগ্রিম নেন। তাদের জায়গার দখল নিতে বললেও তারা সেই সময় দখল নেয়নি। এর কিছুদিন পরে হঠাৎই মুসলমানেরা এসে ঐ জমি দখল নেয় এবং সেখানে খুঁটি পুঁতে দেয়। উক্ত জমিতে নির্মাণের জন্য জালাল সেখরা ভৃগুরামের কাছ থেকে টাকা দাবি করে। হিন্দু সংহতির কর্মীরা খবরটা জানার পর এলাকায় গিয়ে অবৈধ ভাবে পোঁতা খুঁটিগুলি ভেঙে দেয়। থানায় বিষয়টি নিয়ে জানানোও হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলগুলো বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। পুলিশও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারপর ৬ই মার্চ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ভৃগুরামকে ডেকে একটি মীমাংসা পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়। এই মীমাংসা পত্রে লেখা আছে যে ঐ নির্দিষ্ট জমি ভৃগুরাম স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মুসলমানদের দান করছেন।

একের পর এক গরু চুরির ঘটনায় জেরবার কুস্তিয়া, ধপধপি অঞ্চল

বিগত কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুস্তিয়া, প্রসাদপুর ও ধপধপি অঞ্চলে একের পর এক গরু চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষ জেরবার। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশে রিপোর্ট করেও কোন লাভ হয়নি। অনেকগুলি চুরির ঘটনায় গ্রামবাসীরা কোন এক অজ্ঞাতকারণে পুলিশে কোন ডাইরিই করেনি। উল্লেখ্য যে, কুস্তিয়া ও প্রসাদপুর অঞ্চল সোনারপুর থানার অন্তর্গত এবং ধপধপি বারুইপুর থানার অন্তর্গত।

অভিযোগ পেয়ে হিন্দু সংহতির বারুইপুর শাখার কর্মী প্রিয়ঙ্কর সাঁপুই, তপন মন্ডল ও নিত্যবাবু এলাকা পরিদর্শনে যায়। গ্রামবাসীরা তাদের জানায় যে, দীর্ঘদিন ধরে রাতের অন্ধকারে এলাকা থেকে গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। কুস্তিয়া-প্রসাদপুর অঞ্চলের শুভঙ্কর হালদার, বাসুদেব মন্ডল, বিশ্বনাথ মন্ডল, গোবিন্দ মন্ডল, ঝর্ণা মন্ডল, বেচুরাম সরদার, সুকুমার সাঁপুই, পরেশ শিকারী প্রত্যেকেরই গত কয়েকমাসের বিভিন্ন সময়ে গরু চুরি গিয়েছে। নন্দলাল সরদার নামক ধপধপির এক ব্যক্তিরও গরু চুরি যায়। দিনক্ষণ উল্লেখ করে নিম্নে তারই একটি তালিকা পেশ করা হল—

বিশ্বনাথ মন্ডল। গরু চুরি হয় ১৬/১/১৩, শুক্রবার। ডাইরি করা হয়নি।

বাসুদেব মন্ডল। ২টি গরু ও একটি ছাগল চুরি হয় ১/১১/১৩, শুক্রবার। ডাইরি করা হয়নি।

শুভঙ্কর হালদার। ২টি গরু চুরি হয় ২১/১/১৪, মঙ্গলবার। ডাইরি করা হয়নি।

গোবিন্দ মন্ডল। ১টি গরু চুরি হয় ৪/২/১৪, মঙ্গলবার। ডাইরি করা হয়নি।

সুকুমার সাঁপুই। ১টি গরু চুরি হয় ১৩/২/১৪, বৃহস্পতিবার। ডাইরি করা হয়নি।

ঝর্ণা মন্ডল। ১টি গরু চুরি হয় ১৪/৩/১৪, শুক্রবার। ডাইরি করা হয়নি।

বেচুরাম সরদার। ১টি গরু চুরি হয় ২২/৩/১৪, শনিবার। ২৬/৩/১৪-এ ডাইরি করা হয়েছে।

নন্দলাল সরদার। ১টি গরু চুরি যায় ২২/৩/১৪, শনিবার। ডাইরি করা হয়নি।

পরেশ শিকারী। ২টি গরু চুরি যায় ২৪/৩/১৪, সোমবার। ডাইরি করা হয়নি।

সাহসিকতার পরিচয় দিল পুলিশ

জখম হয়েও ডাকাতি রুখে দিল নাদনঘাট থানার ও.সি.

জখম হয়েও আগ্নেয়াস্ত্র সমেত পাঁচ দুষ্কৃতিকে ধরলেন সদ্য তৈরি হওয়া নাদনঘাট থানার ও.সি. সনৎ দাস। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান জেলার কালনায়।

দুঃসাহসিক সনৎবাবু এর আগেও এরকম সাহসিকতার অনেক নজির রেখেছেন কর্মজীবনে। পূর্বস্থলী থানা ভেঙে তৈরি হওয়া নাদনঘাট থানার ও.সি. হিসাবে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন কিছুদিন আগেই। গোপনসূত্রে পুলিশ খবর পায়, ভাণ্ডারকুরি স্টেশনে নেমে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নাদনঘাটের জাহান্নগর এলাকায় জনাকয়েক দুষ্কৃতি জড়ো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দেন সনৎবাবু। সঙ্গী ছিলেন এস.ডি.পি.ও (কালনা) ইন্দ্রজিৎ সরকার ও কালনার সি.আই. রাকেশ মিত্র। রাত এগারোটা নাগাদ জাহান্নগরের মাঠে দুষ্কৃতিদের ঘিরে ফেলে পুলিশ। দুষ্কৃতিরাও পাল্টা দেওয়ার চেষ্টা করে। বন্দুক তাক করে এক কনস্টেবলের দিকে। সনৎবাবু ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দেন মাটিতে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চোট লাগে তাঁর বাঁ হাতে। কিন্তু পিছু না হটে সহকর্মীদের সাহায্যে পাকড়াও করেন ডাকাতদের। ডাকাত দলে পাঁচজন ছিল। এস.ডি.পি.ও. জানানা, ধৃতদের নাম সাবর আলি শেখ, নাদু শেখ, ছাদরউদ্দিন শেখ, ইয়ার আলি ও রহিম শেখ। প্রথম তিনজনের বাড়ি বাবুইডাঙায়। ইয়ার আলি ও রহিম শেখের বাড়ি নাকাশিপাড়া থানার আকুনডাঙায়। তাদের কাছ থেকে চারটি পাইপগান, ন'রাউন্ড কার্তুজ ও চারটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

বসিরহাট সীমান্তে উৎসব পরিণত হল আতঙ্কে

দেবাদিত্য ঃ গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাণী রাসমণি এভিনিউর মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখছিলেন সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। ৩০ হাজার শ্রোতাসহ কয়েকশ পুলিশের সামনে তিনি সরাসরি অভিযোগ করলেন যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্তে যে ব্যাপক চোরাকারবার চলছে তার উপার্জনের একটা অংশ পুলিশের বড় কর্তাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌছায়। সেই কারণেই কুখ্যাত অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে তাদের কালো ব্যবসা নির্বিঘ্নে চালাতে পারছে। কথাটা শোনার পর ভাবলাম এবার আর রেহাই নেই। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তপনদার বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ কেস করবেই। পুলিশ এবং রাজ্যসরকারের হাতে নিজের বিরুদ্ধে এই মোক্ষম অস্ত্র তিনি নিজেই তুলে দিলেন। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা আজ পর্যন্ত হল না। মনের মধ্যে প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছিল---এই গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও কোন প্রতিক্রিয়া নেই কেন? যে প্রশাসন একটা সভা করতে এত বাধা দিল হিন্দু সংহতিকে, সেই প্রশাসন এতবড় সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার করলো না কেন? তপন ঘোষকে আবার জেল খাটানোর সুবর্ণ সুযোগ রাজ্যপুলিশ হাতছাড়া করলো কেন? এই কিল খেয়ে কিল হজমের পিছনে রহস্য কী?

ভেবেছিলাম তপন ঘোষকে উপেক্ষা করে তাঁর এবং তাঁর সংগঠনকে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করার এটা একটা রণকৌশল হতে পারে। কিন্তু কুখ্যাত চোরাচালানকারী আব্দুল বারিক বিশ্বাসের ৪৫ কেজি চোরাই সোনাসহ গ্রেপ্তারের খবর আমার চোখ খুলে দিল। স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমি যা ভেবেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল। তপন ঘোষের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ বা প্রশাসন কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার অন্যতম কারণ, এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। পুলিশের সাথে সাথে পরিবর্তনের ধ্বজাধারী রাজ্যসরকারের কোমর থেকেও সততার কাপড় খসে পড়বে আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে।

আজ দুই ২৪ পরগণার বাংলাদেশ সীমান্তব্যাপী চোরাচালান চক্রের কিং-পিন এই আব্দুল বারিক বিশ্বাস। বিশাল তার সাম্রাজ্য। সে এখন ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। এই সাম্রাজ্য দু-এক দিনে তৈরি হয় নি। দীর্ঘ ২০ বছরের অধ্যাবসায় আছে এর পিছনে। আছে অনেক বোঝাপড়া, অনেক সেটিং-এর ইতিহাস। কারণ সেটিং ছাড়া এতবড় সাম্রাজ্য চালানো অসম্ভব। দিন বদলেছে, রাজ্যের রং বদলেছে কিন্তু এতটুকু আঁচড় লাগেনি তার সাম্রাজ্যে। এ কোন গোপন কার্যকলাপ নয়, বিরাট তার নেটওয়ার্ক। এলাকার একটা ছোট শিশুও জানে এ সম্পর্কে। শুধু জানতে পারেনি আমাদের পুলিশ, গোয়েন্দা এবং তাদের গডফাদাররা! এ কি সম্ভব? নব্বই-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত, সি.পি.এম. থেকে তৃণমূল জমানা—তার সোনার তরী অপ্রতিরোধ্য। আনন্দবাজার ধন্দে— ''সাম্রাজ্য গড়া বারিকের নামে আগে অভিযোগ নেই কেন?'' সাধারণ মানুষ ধন্দে নেই, তপন ঘোষ ধন্দে নেই—সবটাই সেটিং। অনেক উপর পর্যন্ত সেটিং, কত উপর পর্যন্ত তা কেউ কোনদিন জানতে পারবে কি না জানি না।

সি.পি.এম.-এর সঙ্গে আব্দুল বারিকের সরাসরি যোগাযোগের কোন ইতিহাস সামনে আসেনি। তাহলে সেই জমানা সামলানোর রহস্য কী? অবশ্যই লভ্যাংশ। টাকা যেমন মরা মানুষকে কথা বলাতে পারে, তেমন জ্যান্ত মানুষের মুখ বন্ধও করতে পারে। আর একটা এবং সম্ভবতঃ মুখ্য কারণ হয়তো আব্দুল বারিকের পরিচয়—সে যে আমাদের দেশের বড় আদরের সংখ্যালঘু সমাজের একজন। তার উপর হাত পড়লে তো ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তো সে মুক্ত বিহঙ্গ। আর বাংলায় সবুজ পরিবর্তনের যুগে তাকে ছোঁয় কে? আব্দুল বারিকরা তো বর্তমান সরকারি পার্টির সম্পদ। সে সরাসরি রাজনীতিতে না থাকলেও তার দাদা গোলাম বিশ্বাস এখন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। দাদা বলেছেন যে তৃণমূলকে বদনাম করতেই নাকি ভাইকে ফাঁসানো হয়েছে। অর্থাৎ নির্দোষ আব্দুল বারিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার! যে বা যারা তাকে ফাঁসিয়েছে তারা ১৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে তাকে ফাঁসাতে—এ কথা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে! তৃণমূলের সাথে বারিকের ঘনিষ্ঠতার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দাদার প্রচারে মঞ্চেও তাকে দেখা গেছে বার বার। এটা নিশ্চয়ই পার্টির অজ্ঞাতসারে হয়নি। নেতারা অস্বীকার করলেও সাধারণ মানুষ আসল সত্যটা জানে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আব্দুল বারিককে রাজ্যপুলিশ গ্রেপ্তার করেনি, করেছে ডি.আর.আই. অর্থাৎ ডিরেক্টরেট্ অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স। রাজ্য পুলিশের বক্তব্য—যেহেতু বারিকের বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি, তাই তাকে ধরা যায়নি। আইনের ফাঁক খুঁজে অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়ার কী মারাত্মক অপচেষ্টা! আব্দুল বারিক তো কোন সাধারণ চোর নয় যে গৃহস্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে! প্রতিদিন তার নিয়ন্ত্রণে হাজার হাজার গরু সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। সোনা, নকল নোট ও আরও বহু অবৈধ জিনিস সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর দায়িত্ব কার? সাধারণ গৃহস্থের না পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের? এত আই.বি., এস.বি., এস.এস.বি., সি.আই.ডি., RAW-এরা সবাই কী করছে? তাই জেলা ও রাজ্য পুলিশের অধিকর্তারা যখন এই বয়ান দিলেন যে, আব্দুল বারিকের নামে কোন থানায় অভিযোগ নেই বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি—তখন এর দ্বারা পুলিশ অধিকর্তারা নিজেদেরকেই জনসমক্ষে নগ্ন করে দিলেন। ঘুষের টাকায় এদের চামড়া এতই মোটা হয়ে গিয়েছে যে, সেকথা বোঝার ক্ষমতাও এরা হারিয়ে ফেলেছেন।

পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আব্দুল বারিকের প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা দেখে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে তারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সাহস করবে? তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের আবেদনের সময় পুলিশ তো তদন্ত করেছে বারিকের সম্পর্কে। সেই তদন্তে কী পেয়েছে পুলিশ? আব্দুল বারিক একজন মহান এবং সৎ ব্যক্তি? আসলে সবই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা।

আব্দুল বারিক বিশ্বাসের জামিনের খবর সকালেই পেলাম। মাত্র তিনদিনের মধ্যেই আব্দুল বারিক জামিন পেয়ে গেল। টেকনিকাল ফল্টের কারণেই নাকি জামিন দেওয়া হল এই কুখ্যাত অপরাধীকে। টাকার খেলায় না রাজনৈতিক চাপে এই জামিনের ব্যবস্থা তা সময়ই বলবে। কিন্তু এই জামিন কোর্ট এবং বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধেও প্রশ্ন খাড়া করে দিয়েছে। যতই টেকনিকাল ফল্ট বা পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকুক না কেন, অন্য যে কোন এইরকম গুরুতর অপরাধীর ক্ষেত্রে তদন্তের স্বার্থে কমপক্ষে কয়েকদিনের জন্য তাকে পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হত। এক্ষেত্রে তা হল না। তাই আব্দুল বারিকের পয়সার গমন কতদুর—তা এক গভীর চিন্তার বিষয়। শেষ কথা হল থানা-পুলিশ, আইন-আদালত এবং সংবিধান—কোন কিছুই এক কুখ্যাত গো-পাচারকারী ও স্মাগলারকে আটকে রাখতে পারল না।

গত মঙ্গলবার আব্দুল বারিকের গ্রেপ্তারের খবরে বনগাঁ-বসিরহাটের সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ উৎসব শুরু করে দিয়েছিল। সেই উৎসব আবার আতঙ্কে পরিণত হল। এর পরেও মানুষ যাবে থানায় অভিযোগ জানাতে? সাধারণ মানুষ, গৃহস্থ মানুষ তো তা পারবে না! আইন-আদালত, পার্টি-প্রশাসনের দৌড় তো দেখে নিল মানুষ। তাই এ রাজ্যে টিকে থাকতে হলে তাদের সামনে শেষপর্যন্ত কি একটি মাত্র পথই খোলা থাকলো? সেটা কি ''হিন্দু মাওবাদের'' নামে মাওবাদের এক নতুন সংস্করণ তৈরি করা? অথবা তামিল সংগ্রামী যোদ্ধাদের অনুকরণ করা? তপন ঘোষের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর বক্তব্য কি হিন্দু যুবকদের সেই পথে যাওয়ারই ইঙ্গিত বহন করছে?

বজবজ বাওয়ালী যুবক সংঘ-এ 'স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করছেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ

সামশেরগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের সামশেরগঞ্জ থানার কাগাছি গ্রামে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম জামু শেখ। মেয়েটির বাড়ির লোকের অভিযোগে ঘটনার দিন রাতেই জামু শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ২৫ মার্চ বিকালে ওই ছাত্রী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাঠে যায়। সেই সময় মাঠে জামু শেখ কাজ করছিল। মেয়েটিকে মাঠে একা পেয়ে জামু শেখ তাকে ধর্ষণ করে। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ পরেও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন ওই ছাত্রীর মা মাঠে খুঁজতে যান। সেখানে তিনি দেখেন মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করাতে ওই ছাত্রী গোটা ঘটনা তার মা'কে বলে। ওই রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রীর মা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মেডিকেল টেস্টের জন্য নির্যাতিতা ছাত্রীকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জেহাদের জন্য ছেলেদের 'কুরবানি'

মুসলমানদের কাছে জেহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম অনুযায়ী যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়, সে সরাসরি বেহেস্তে যায়, সে জীবনে একবারও নামাজ না পড়লেও। তাই পাকিস্তানের নানকানা সাহিবের বাসিন্দা আবু্দ হায়দার নিজের তিন ছেলেকে উৎসর্গ করলেন এই পবিত্র জেহাদের উদ্দেশ্যে। ২০০৮ সালের মুম্বই হামলায় জড়িত লস্কর-ই-তৈবার প্রকাশ্য সংগঠন জামাত-উদ্-দাওয়ার নেতা হাফিজ মহম্মদ সঈদের হাতে নিজের তিন ছেলেকে তুলে দিয়ে আবুল বলেন, 'এবার থেকে আমার তিন ছেলে আপনার লড়াইয়ের সঙ্গী। তারা আপনার নির্দেশ মেনে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে।'

তিনজন তরুণ জেহাদীকে হাতে পেয়ে উৎফুল্ল হাফিজের হুঙ্কার— 'জেহাদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়, বিধর্মী বা কাফেরদের বিরুদ্ধে। মুসলিমদের নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই কখনও জেহাদ হতে পারে না।'

অস্ত্র উদ্ধার ঃ পুলিশের উপর হামলা

গত ৮ই মার্চ জেলা পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে দঃ ২৪ পরগণার আমডাঙা থানার বহিরগাছি গ্রামে উদ্ধার করল ২৪টি তাজা বোমা সহ দেশী বন্দুক, লং রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র। দীর্ঘদিন ধরে সি.পি.এম.-এর গড় বলে পরিচিত এই এলাকায় গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় খুন হয় সি.পি.এম. সমর্থক জনৈক মাদার আলি বক্স। এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাদেক হোসেনকে খুঁজতে এসেই এই অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। তল্লাসি চলাকালীন গ্রামবাসীরা পুলিশকে আক্রমণ করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই আক্রমণে একজন মহিলা পুলিশসহ পাঁচজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হন।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <www.hindusamhatibangla.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012